FEB. 28 2001

ভোরের কাগজ | তারিখ ... | পৃষ্ঠা ... ৪ | কলাম ৩ ...

শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট

দেশে নারী শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার জন্য সরকার প্রথমে মাধ্যমিক স্তরে পরে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (বর্তমানে অবশ্য প্রাথমিক স্তরেও উপবৃত্তি প্রকল্প চালু হতে যাচ্ছে) উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে। এই উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তগুলো হলো- ১. প্রত্যেক পরীক্ষায় ছাত্রীকে গড়ে ৪৫% নম্বর পেতে হবে। ২. বিদ্যালয়ে গড়ে ৭৫% হাজিরা থাকতে হবে এবং ৩. অবিবাহিতা হতে হবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে এ সকল শর্ত কতোটুকু পালিত হচ্ছে তা সত্যিকার বলা কঠিন। শিক্ষকদের এখন ক্লাসে পাঠ দেওয়ার পরিবর্তে প্রায় সর্বক্ষণ উপবৃত্তির কাজে ব্যস্ত থাকত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মেয়ে ৪৫% নম্বর পাচ্ছে না বা ৭৫% হাজিরা নেই অথবা বিয়েই হয়ে যাচ্ছ। সেক্ষেত্রে মেয়ে বা সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা শরণাপন্ন হচ্ছেন এলাকার প্রভাবশালীদের। আর প্রভাবশালীরা এসে শিক্ষকদের দিয়ে যেকোনো প্রকারেই হোক এসব শর্ত পূরণ করানোর চেষ্টা করেন বা পূরণ করান। আর এই সুযোগে উত্তরপত্র, হাজিরা খাতা ইত্যাদি তদন্তের নামে অনেক উপবৃত্তির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হাতিয়ে নিচ্ছেন অজস্র টাকা।

আবার সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির সুবাদে এখন দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র। আর বাড়ির কাছের এই কেন্দ্রগুলোতে একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে নকল সরবরাহ করতে আসছে ক্ষেত্রবিশেষে বেশ কয়েকজন এবং নিয়ম কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে চালিয়ে যাচ্ছে নকল সরবরাহ অভিযান। আর এই ব্যাপারে কোনো শিক্ষক পরীক্ষার হলে নকল করতে বাধা দিলে তাকে পরীক্ষার হলের বাইরে হতে হয় বিভিন্ন প্রকার হুমকির সম্মুখীন।

উপরের দুটো উদাহরণ এটুকুই প্রমাণ করছে যে, আমাদের যার কাছে যতোটুকু সুযোগ বা ক্ষমতা আসছে আমরা ঠিক ততোটুকুরই অপব্যবহার করে সংকট সৃষ্টি করছি এবং দুর্নীতি ও সন্ত্রাসই করছি।

একজন শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাক্ষেত্রের কিছু সমস্যা ও শিক্ষক হিসেবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নিচ্ছি। আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও শিক্ষক নিয়ে ব্যাপক হইচই হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ঠিকমতো লেখাপড়া হচ্ছে না। শিক্ষকরা ক্লাসে ঠিকমতো পাঠদান করেন না ইত্যাদি। এসব অভিযোগ সর্বাংশে সত্য না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে অভিযোগগুলো গ্রামের বেসরকারি মধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য কতোটুকু প্রযোজ্য তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ শহরের বড়ো বড়ো সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোয় যেখানে ভর্তি হওয়াই কঠিন সেখানে এসব সমস্যা প্রকট বলে আমার মনে হয়। গ্রামের বেসরকারি স্কুলগুলো যেখানে বছরের ছয় মাস শিক্ষকদের বেতন বাকি থাকে সেখানে এমন আচরণ করলেতো ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়ে শিক্ষকদের বেতন আরো বাকি পড়বে। তাহলে গ্রামের স্কুলগুলোর রেজাল্ট খারাপ হয় কেন? এমন প্রশ্ন দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। আসলে ব্যাপারটা হলো গ্রামের স্কুলগুলোতে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের কোনো প্রকার যোগ্যতাই যাচাই করা হয় না। যার ফলে পঞ্চম শ্রেণী পাস একটা সনদ নিয়ে সহজেই যেকোনো শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে। এরকম সনদধারীদের মধ্যে এমন শিক্ষার্থীও পাওয়া যায় যারা ইংরেজি অক্ষরগুলো ভালোভাবে চিনে না। সাধারণ যোগ-বিয়োগ করতে পারে না। এখন মাধ্যমিক পর্যায়ে কি শিক্ষক নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করবেন না অক্ষরজ্ঞান দিবেন, না যোগ-বিয়োগ শিখাবেন? তাহলে এখন কথা উঠতে পারে আমি নিজেদের ধোয়া তুলসিপাতা বানিয়ে সকল দোষ প্রাথমিক শিক্ষা বা শিক্ষকদের ওপর চাপাচ্ছি।

না আমি তা করছি না। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আমি যতোটুকু দেখেছি— সেখানে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম এবং গ্রামের অধিকাংশ অভিভাবক নিরক্ষর হওয়ার কারণে অথবা শিক্ষার গুরুত্ব না বোঝার কারণে তারা বাড়িতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি কোনো মনযোগ দেন না বললেই চলে। ফলে বছরের পর বছর এ সকল শিক্ষার্থীই কিছু না জেনেই প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে মাধ্যমিক স্তরে আসছে। আর এখানে এসেও তারা হাবুডুবু খায়। আর এদেরকে যদি কোনো ক্লাসের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তী ক্লাসে প্রমোশন দেওয়া না হয় তাহলেই চলে আসেন এলাকার প্রভাবশালীরা। মেয়ে হলে উপবৃত্তি বন্ধ হবে বা বিয়ে দিতে সমস্যা হবে অথবা ছেলে হলে চাকরি-বাকরি বা অন্য কোনো কারণ দেখিয়ে অথবা কোনো কারণ না দেখিয়েও প্রমোশন নিয়েই ছাড়েন।

এভাবেই তারা বছরের পর বছর পেরিয়ে আসে দশম শ্রেণীতে। দশম শ্রেণীতে নির্বাচনী পরীক্ষায় তাদের আর বাদ দেয় এমন সাধ্যকার? তখন অতীতের সকল কথা বেমালুম ভুলে এক কথাতে এসেই অনড় হয়- এতো খারাপ ছাত্রছাত্রী দশম শ্রেণীতে প্রমোশন পেলো কিভাবে? ৫-১০টা বছর শেষে এখন আপনারা তাদেরকে পরীক্ষা (এসএসসি) দিতে দিবেন না কোন যুক্তিতে? তার মানে আমাদের যার যেখানে ক্ষমতা যতোটুকু আছে আমরা তা দিয়েই এক প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, এসব বিদ্যালয়েও আযোগ্য এবং দায়িত্বের প্রতি অবহেলাকারী শিক্ষক যে একেবারেই নেই তা নয়। যোগ্যতার বিচারে প্রকৃতপক্ষে এরা শিক্ষকতা চাকরি পাওয়ার মতো বলে মনে হয় না। তথাপি কোথাও প্রভাবশালী মহলের চাপে বা অন্য যেকোনো কারণ দেখিয়ে এরা চাকরিতে প্রবেশ করেন, আর পরে যোগ্যতা ও স্বভাব অনুযায়ী যা করার তাই করেন। আর এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এমন শিক্ষকও আছেন যারা শিক্ষার্থীদের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল, ক্লাসে পাঠদানে যথেষ্ট আন্তরিক। অথচ এই সকল শিক্ষককে যখন তার সামান্য টাইম স্কেলটা সম্পূর্ণ বৈধভাবে পাওয়ার জন্য শিক্ষা অফিসসমূহের উপর থেকে নিচ (গুটিকতক ব্যতিক্রম ছাড়া) পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় অথবা ব্যাংকে বেতনের টাকাগুলো তুলতে গেলে হতে হয় লাঞ্ছিত, সেই শিক্ষক আর কতোদিন সততা নিয়ে চলতে পারে? কতোদিন তার নির্লোভ মানসিকতা ধরে রাখতে পারে?

শ্রেণীতে সুষ্ঠুভাবে পাঠদান একটি সৃষ্টিশীল ও গতিশীল প্রক্রিয়া। আজকে যে পদ্ধতিতে পাঠ দেওয়া হলো আগামীকাল দেখা গেলো এর চেয়েও ভালো এবং ফলপ্রসূ প্রক্রিয়ায় এ পাঠটি দেওয়া যেতো বা যায়। আর এভাবেই একজন শিক্ষক দিনের পর দিন নিজস্ব চিন্তা ও চেতনার দ্বারা একটি দুর্বোধ্য পাঠকে করে তুলতে পারেন- শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত সহজবোধ্যও প্রাঞ্জল। কিন্তু সেই পরিবেশ এবং সুযোগ কি আরো শিক্ষককে দিচ্ছি?

দেশের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে চলে নকলের মহোৎসব। এতো বড়ো এই সর্বনাশা কাণ্ড দেখেও সবাই যেন নির্বিকার। এর জন্য সবাই অবশ্য শিক্ষক-অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট অনেককেই দায়ী করেন। আমি আরেকটা নতুন বিষয়কেও দায়ী করবো। সেটা হলো এ রকম-পরীক্ষাতে কেউ ভালো নম্বর পেলে বা ভালো ফলাফল করতে পারলেই তার জন্য চাকরি বাজার বা উচ্চ শিক্ষার দরজা সব খোলা। তার জ্ঞানের সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। আর এ কারণেই আমাদের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা অধিক নম্বর ও উচ্চ বিভাগ বা শ্রেণী (প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি) পাওয়ার জন্য যতো সহজ পথ আছে সবগুলোরই দ্বারস্থ হয়। যদি বিভাগ বা শ্রেণীর পরিবর্তে জ্ঞানের সঠিক পরিমাপের কোনো ব্যবস্থা হতো, যদি মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে সৃষ্টিশীলতার পরিমাপ হতো তাহলে এতো অসুস্থ প্রতিযোগিতার অনেকটাই নিবারিত হতো বলে আমার বিশ্বাস।

জনৈক শিক্ষক
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।